কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা: একটি বিশ্লেষণ

ড. প্রমথ মিস্ত্রী*

Abstract: There are two structural and thematic forms of Sanskrit literature- Driśyakāvay and Śravyakāvya. There are two types of Dṛśyakāvya- rūpaka and uparūpaka. There are three types of Śravyakāvya- gadyakāvya, padyakāvya and campukāvya. Kathā and Ākhyāyikā are the two divisions of gadyakāvya. And padyakāvya has three divisions- Mahākāvya, Khandkāvya and Koṣakāvya. A collection of verses that are not dependent on each other is called Koṣakāvya. Cānakya wrote his Ethics by adopting the characteristics of Koṣakāvya. Such anthologies act as beacon in determining the duty in various situations that arise in the course of life. It is no exaggeration to say that Koṣakāvya's subhaṣitas are directional instruments. Again subhaṣita saṁgraha is composed of mundane proverbs or just advice. Cānakya-Nītiśāstra is a special advice. This book is a wonderful collection of many advice and various mottos on politics, social policy etc. People from all walks of life can learn its moral teachings. He wrote it seeing the moral decay of the society of that time. His verses which are necessary for all societies of all times are eternal beacons of human welfare. Cānakya's philosophy of vidyā-avidyā or vidvyān-avidvyān can save us from the moral degradation that we see in today`s world under the influence of avidyā or avidvyān . The purpose of the present essay is to highlight how we can acquire true knowledge thought the process of using the principles of vidyā-avidyā or vidvyān-avidvyān.

ভূমিকা

চাণক্য একজন অতিপ্রসিদ্ধ ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ। তিনি শুধু কূটনীতিক ছিলেন না, ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর সব কূটনীতি দেশের মঙ্গলের জন্যই। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বড় লেখকও বটে। তিনি প্রাচীন ভারতের খ্যাতিমান পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা ছিলেন। রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৯৭ অব্দ ছিল। সুতরাং চাণক্যের আবির্ভাবকাল হয় খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক (চৈতালী ২০১৪: ১০)। চাণক্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আজও কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর পিতার নাম 'চণক' মুনি। তিনি চণকের পুত্র বা চণকবংশীয় সন্তান বলে 'চাণক্য' (চণকস্য অপত্যম্ = চণক + যঞ্ = চাণক্য, 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' পাণিনি ৪/১/১০৫ সূত্রানুসারে) নামে পরিচিত (প্রবীরকুমার ২০২৪: ৭)। তাঁর মাতার নাম আজও জানা যায়নি। তিনি অবিভক্ত ভারতের তক্ষশিলা (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন (মালবিকা ও অন্যান্য ২০২৩: ভূমিকা– ৭)। তাঁর একাধিক নাম ছিল– কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি। তাঁর প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তিনি চাণক্য ও কৌটিল্য নামে সমধিক পরিচিত। অনেকের মতে কুটিলমতি হওয়ার কারণে তিনি 'কৌটিল্য' নামে খ্যাত হন। বিশাখদত্তের

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রারাক্ষস নাটকে আছে– 'কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষঃ' (সত্যনারায়ণ ১৯৯০: ১৪)। সম্ভবত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। শোনা যায়, চন্দ্রগুপ্তের রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শেষ জীবনে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। আর তখন থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো *অর্থশাস্ত্র*। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ, কাম, আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেন। তবে তাঁর প্রধান গ্রন্থ *অর্থশাস্ত্র* হলেও তিনি নীতিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর মূল নীতিশাস্ত্র *বৃদ্ধচাণক্য*-এ ৬০০০ (ছয় হাজার) শ্লোক আছে। এ সম্পর্কে *দশকুমারচরিতে* উক্ত হয়–

ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড়ুভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা (চৈতালী ২০১৪: ১৪)।

অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকসমূহ নিয়ে পরবর্তী সময়ে *বৃদ্ধচাণক্য* (অলংকৃত, শ্লোক সংখ্যা– ৩৪২), *বৃদ্ধচাণক্য* (সরল, শ্লোক সংখ্যা– ১০৯/১৭৩), *বোধিচাণক্য*, *লঘুচাণক্য*, *চাণক্যনীতিশাস্ত্র*, *চাণক্যসারসংগ্রহ*, *চাণক্য-রাজনীতি-শাস্ত্র* প্রভৃতি সংস্করণ প্রণীত হয়। মনে হয় পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্যই এরূপ সংস্করণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্করণে শ্লোক সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *চাণক্য-সুভাষিত-শ্লোক-সংগ্রহ (শ্লোক সংখ্যা– ১০৮)* এবং অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *চাণক্যশ্লোক (শ্লোক সংখ্যা– ১০৯)* গ্রন্থদ্বয় থেকে শ্লোক নেওয়া হয়েছে। শ্লোক সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে ১০৮ সংখ্যক শ্লোকযুক্ত সংস্করণকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান চাণক্যশ্লোকের সংখ্যা অল্প কিন্তু বিষয়বস্তু ব্যাপক। ফলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে বিদ্বান-অবিদ্বান, সুপুত্র-কুপুত্র, শত্রু-মিত্র, সুজন-কুজনের কর্মকাণ্ড নীতিশ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটির শিরোনাম **'চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা: একটি বিশ্লেষণ'**। 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' শব্দদুটির অর্থ ব্যাপক। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে 'বিদ্যা' বলতে অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিষয়ক তথা পারমার্থিক জ্ঞান) এবং 'অবিদ্যা' বলতে জাগতিক জ্ঞান (মায়া, অজ্ঞান) বোঝায়। এক্ষেত্রে 'বিদ্যা' বলতে অধ্যয়নাদি জ্ঞান ও অবিদ্যা বলতে অনধ্যয়নাদি অজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। যা চাণক্যের বিদ্বান ও অবিদ্বানের কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। বিদ্বানের ভালো কাজ মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে অবিদ্বানের খারাপ কাজ মানুষকে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে। চাণক্যের বিদ্বান-অবিদ্বান সম্পর্কিত নীতিকথাগুলো বর্তমানে আমরা হৃদয়ে ধারণ করে একদিকে যেমন প্রকৃত মানুষ হতে পারি অন্যদিকে তেমন কুকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে পারি। মানুষকে বিদ্যা অর্জন করে প্রকৃত বিদ্বান হতে উৎসাহিত করা এবং অবিদ্বান (দুর্জন মানুষ) থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো।

প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যা-অবিদ্যা

প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যা-অবিদ্যা সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য যেমন– *উপনিষদ*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যা-অবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। *উপনিষদ*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-য়* 'বিদ্যা' বলতে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং 'অবিদ্যা' বলতে জাগতিক জ্ঞান বোঝায়। অন্যত্র যেমন– *অর্থশাস্ত্র*, *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ*, *নীতিশতক* প্রভৃতি গ্রন্থেও বিদ্যা-অবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যা-অবিদ্যা বলতে যথাক্রমে অধ্যয়ন ও অনধ্যয়নজনিত জ্ঞান ও অজ্ঞানকে বোঝায়। নিম্নে উক্ত গ্রন্থগুলো থেকে বিদ্যা-অবিদ্যার দুএকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

উপনিষদ (রাধাকৃষ্ণনের মতে ১০০০খ্রিষ্টপূর্বে, অন্যান্যদের মতে ৭০০খ্রিষ্টপূর্বে রচিত)

আমরা উপনিষদে বিদ্যা-অবিদ্যার চর্চা সম্পর্কে সুফল-কুফল দেখতে পাই। যারা অবিদ্যার চর্চা করে, তারা অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যারা কর্মানুষ্ঠান ছেড়ে কেবল বিদ্যার চর্চা করে, তারা তার থেকেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। তাই ঈশোপনিষদে উক্ত হয়–

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে২ বিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯ (অতুল ও অন্যান্য ২০০০: ১৭)

উক্ত শ্লোকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য অবিদ্যা এবং কর্ম ব্যতীত বিদ্যা আলাদাভাবে চর্চা করায় দোষ আছে। এর থেকে উত্তরণে উপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই একই সঙ্গে চর্চা করেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) লাভ করেন। তাই ঈশোপনিষদে উক্ত হয়–

> বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১ (অতুল ও অন্যান্য ২০০০: ১৮)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০শতকে রচিত)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
> তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ জ্ঞানযোগ, ৪/৩৮
> (জগদীশচন্দ্র ১৯৯৬: ১৬৬)

অর্থাৎ, ইহলোকে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নাই। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজেই অন্তরে লাভ করেন।

> শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ জ্ঞানযোগ, ৪/৩৯ (জগদীশচন্দ্র ১৯৯৬: ১৬৬)

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন।

অর্থশাস্ত্র (খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত)

> কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন–
> আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ। ১.২.১ (মানবেন্দু ২০১৪: ৭৩)

অর্থ: আন্বীক্ষিকী (যুক্তিবিদ্যা), ত্রয়ী (ত্রিবেদাত্মক বিদ্যা), বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যবিষয়ক বিদ্যা) ও দণ্ডনীতি (রাজনীতি বিদ্যা)।

> চতস্র এব বিদ্যা ইতি কৌটিল্যঃ। (মানবেন্দু ২০১৪: ৭৩)

কৌটিল্যের মতে বিদ্যা এই চার প্রকার।

পঞ্চতন্ত্র (খ্রিষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত)

বিষ্ণুশর্মা *পঞ্চতন্ত্রে* বলেছেন–

> বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ মিত্রপ্রাপ্তি– ৫৭ (প্রসূন ২০১৪: ২৯৯)

অর্থাৎ, রাজা কেবল নিজ দেশেই সম্মান পান। আর বিদ্বান সর্বত্র সম্মান পান।

হিতোপদেশ (নবম শতকের পর চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী ১৩৭৩খ্রিষ্টাব্দে রচিত)
নারায়ণ পণ্ডিত *হিতোপদেশে* বলেছেন–

> সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
> অহার্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা॥ মিত্রলাভ, প্রস্তাবিকা– ৪
> (প্রসূন ২০১৪: ৩২৫)

অর্থাৎ, সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। কেননা কেউ তা অপহরণ করতে পারে না, তা অমূল্য এবং ক্ষয়হীন।

নীতিশতক (খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিকে রচিত)

ভর্তৃহরির *নীতিশতকে* বলেছেন–

> বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
> বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
> বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা
> বিদ্যা রাজসু পূজিতা ন তু ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥ ২০ (দুলাল ২০১৮: ৮৮)

অর্থাৎ, বিদ্যা অর্জন মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। বিদ্যার তুল্য সম্পদ দ্বিতীয় আর জগতে নেই। এই সম্পদ যাঁর আছে, স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই তিনি পূজিত হন। বিদ্যা মানুষের চিরস্থায়ী অলঙ্কার।

চাণক্য নীতিশাস্ত্রে বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান

ভূমিকাতে বিদ্যা-অবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিদ্যা-অবিদ্যা বলতে অধ্যয়ন ও অনধ্যয়নজনিত জ্ঞান ও অজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। এখন শব্দদুটির ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। 'বিদ্যা' শব্দটি বিদ্-ধাতু যোগ ক্যপ্ প্রত্যয় ও স্ত্রিয়াম্ আপ্ যোগে (√বিদ্ + ক্যপ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = বিদ্যা + সুপ্ = বিদ্যা) নিষ্পন্ন হয়েছে। বিদ্-ধাতুর অর্থ জানা। কিন্তু 'বিদ্যা' পদের অর্থ জ্ঞান। আর যা জ্ঞান নয় অর্থাৎ অজ্ঞান তাই অবিদ্যা (ন-বিদ্যা = অবিদ্যা) (অশোককুমার ২০০৫: ৩৭৯, ৬০)। সুপ্রাচীনকাল থেকেই একদিকে যেমন বিদ্যার প্রশংসা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমন অবিদ্যার নিন্দা করা হয়েছে। চাণক্য নীতিশাস্ত্রেও তেমনটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিভিন্ন শ্লোকে যেমন বিদ্যার মাহাত্ম্য তথা প্রশস্তি গেয়েছেন, তেমন অবিদ্যার নিন্দাও করেছেন। মানুষ চায় জীবনে যশ ও অর্থের প্রাপ্তি। একমাত্র বিদ্যাই অর্থ ও যশ দুই-ই এনে দিতে পারে। এছাড়া বিদ্যার ক্ষয় ও বিনাশ নেই। তাই বিদ্যা অর্জনই মানুষের মূল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে অবিদ্যার মাধ্যমে মানুষের জীবনে কোনো কিছু অর্জিত হয় না। নেমে আসে তার জীবনে অধঃপতন। চাণক্য যেসব শ্লোকে একইসাথে বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান, পৃথকভাবে বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের কথা বলেছেন সেসব শ্লোকের মর্মার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাকরণ (অর্থাৎ অর্থযুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়) আলোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় বিশ্লেষণ করা হলো।

চাণক্য-নীতিশাস্ত্রে একইসাথে বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান

চাণক্য-নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের কথা বলা হয়েছে। শ্লোকগুলো থেকে আমরা বিদ্বান-অবিদ্বানের সুফল-কুফল সম্পর্কে জানতে পারি। নিম্নে যেসব শ্লোকে বিদ্বান-অবিদ্বানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

পণ্ডিতজনে সকল গুণ বর্তমান, মূর্খজনে কেবল দোষই পাওয় যায়। সেজন্য হাজার হাজার মূর্খের তুলনায় একজন বিদ্বানই শ্রেষ্ঠ। তাই উক্ত হয়–

> পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।
> তস্মান্মুর্খ সহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥ ২ (মানবেন্দু ২০১১: ২২)

[তস্মান্মুর্খ = তস্মাৎ + মূর্খ, বিশিষ্যতে = বি-√শিষ্ + যক্ + লট্-তে]
যেমন মেঘ দ্বারা সূর্যকিরণ আচ্ছাদিত হয়, সেরূপ পরস্পর পশুর মতো আচরণকারী মূর্খদের দ্বারা পরিবৃত গুণীর গুণাবলিও আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। তাই উক্ত হয়–

> বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
> প্রচ্ছাদ্যয়ন্তে গুণাঃ সর্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥ ১৯ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৩)

[প্রচ্ছাদ্যয়ন্তে = প্রচ্ছাদি + অন্তে, মেঘৈরিব = মেঘৈঃ + ইব]

গুণ না থাকলে কেবল রূপের কোনো মর্যাদা নেই, দুর্জন উত্তম কুলে জন্মালেও কেউ তাকে সম্মান করে না, সদাচার না থাকলে বিদ্যার কোনো ফল হয় না এবং ভোগ না করলে ধন দ্বারাও কোনো লাভ হয় না। তাই উক্ত হয়–

> নির্গুণস্য হতং রূপং দুশীলস্য হতং কুলম্।
> অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা চাভোগেন হতং ধনম্॥ ২০ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৪)

[নির্গুণস্য = নির্ (নিঃ) + গুণস্য, দুশীলস্য = দুর্ (দুঃ) + শীলস্য]
সহস্র সহস্র শোকের এবং শত শত ভয়ের কারণ সর্বদাই বর্তমান রয়েছে। মূর্খ ব্যক্তিরা ঐ সকলের ভাবনা করে নিরন্তর ব্যাকুলিত থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেদিকে দৃষ্টিই করেন না। তাই উক্ত হয়–

> শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
> দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥ ২২ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৫)

[মূঢ়মাবিশন্তি = মূঢ়ম্ + আবিশন্তি (আ-√বিশ্ + লট্-অন্তি)]

চাণক্য নীতিশাস্ত্রে পৃথকভাবে বিদ্যা তথা বিদ্বান

মর্মার্থ: বিদ্যা জগতের সর্বত্র সমাদৃত হয়। এটি মানুষের অর্জিত অতুলনীয় সম্পদ। যিনি এই বিদ্যা সম্যকভাবে অর্জন করেন তিনিই বিদ্বান। বিদ্বানের সম্মান সর্বত্র। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তাঁর সম্মানের কোনো পার্থক্য হয় না। একজন রাজা কেবল তাঁর নিজ দেশেই সম্মানিত হন। কিন্তু একজন বিদ্বান তাঁর নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্যত্র সম্মান লাভ করেন। যেমন– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী নিউটন প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি সারা পৃথিবীতে সম্মানের সাথে উল্লিখিত হন। আমরা একজন বিদ্বানের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারি। বিদ্বান ব্যক্তি পরের স্ত্রীকে মায়ের মতো, স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে নিজ আত্মার মতো দেখেন। তিনি ক্ষমাবান ও সাবধানে চলেন। তিনি দেশে-

বিদেশের সকলের মিত্র। তিনি নির্লোভ ও নির্ধন। স্মর্তব্য, কেউ তাঁর অর্জিত বিদ্যায় ভাগ বসাতে পারে না। তিনি তাঁর বিদ্যা গ্রন্থবদ্ধ না রেখে সদা অন্ধজনকে বিতরণ করেন। তাঁর ওপর একটি দেশের সকল কিছুর ভার বিশ্বাসের সাথে অর্পণ করা যায়। এতে দেশ ও দশের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হয়। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে বিদ্যার তথা বিদ্বানের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে আমরা বিদ্যার তথা বিদ্বানের সুফল সম্পর্কে জানতে পারি। নিম্নে যেসব শ্লোকে বিদ্যার তথা বিদ্বানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

বিদ্যার প্রভাব আর রাজশক্তি কখনও সমান হতে পারে না। রাজা কেবল নিজদেশে সম্মান পান, কিন্তু বিদ্বান সর্বত্রই সম্মান পান। তাই উক্ত হয়–

> বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১ (মানবেন্দু ২০১১: ২১)

[বিদ্বত্ত্বঞ্চ = বিদ্বত্ত্বম্ + চ, নৃপত্বঞ্চ = নৃপত্ত্বম্ + চ, নৈব = ন + এব]
যিনি পরের স্ত্রীকে মায়ের মতো জ্ঞান করেন, পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রসম (মাটির ঢেলার মতো) জ্ঞান করেন এবং সকল জীবকে আপন আত্মার মতো দেখেন বা ভালোবাসেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাই উক্ত হয়–

> মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
> আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ ৩ (মানবেন্দু ২০১১: ২২)

[মাতৃবৎ = মাতৃ+ বতুপ্ (বৎ), লোষ্ট্রবৎ = লোষ্ট্র + বতুপ্, আত্মবৎ = আত্মন্ + বতুপ্, পশ্যতি = √দৃশ্ + লট্-তি]

চন্দ্র রজনীর, পতি রমণীর এবং রাজা পৃথিবীর অলংকার। কিন্তু বিদ্যা সকলেরই অলংকার অর্থাৎ সৌন্দর্যকারক। তাই উক্ত হয়–

> শর্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
> পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্॥ ৭ (মানবেন্দু ২০১১: ২৫)

[পৃথিবীভূষণম্ = পৃথিব্যাঃ ভূষণম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), ভূষণম্ = √ভূষ্ + অনট্ (ল্যুট্)]

কোকিলের কণ্ঠস্বরই সৌন্দর্য। সতীত্বই হলো নারীর শোভা। কদাকার ব্যক্তির বিদ্যাই হলো সৌন্দর্য। আর ক্ষমা হলো তাপসদের সৌন্দর্য। তাই উক্ত হয়–

> কোকিলানাং স্বরো রূপং স্ত্রীণাং রূপং পতিব্রতম্।
> বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥ ৪৪ (অশোককুমার ২০১৭: ৩০)

[স্ত্রীণাম্ = স্ত্রী + ষষ্ঠীর বহুবচন = স্ত্রী + আম্, তপস্বিনাম্ = তপস্বিন্ + ষষ্ঠী বহুবচন = তপস্বিন্ + আম্]

বিদ্যার সমান বন্ধু, রোগের সমান শত্রু, সন্তানের মতো স্নেহপাত্র এবং দৈব হতে অধিকতর বল নাই। তাই উক্ত হয়–

> ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
> ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥ ৯ (মানবেন্দু ২০১১: ২৬)

[বন্ধুর্ন = বন্ধুঃ + ন, চাপত্যসমঃ = চ + অপত্যসমঃ]

বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পায়ে হাঁটেন ও অপর পায়ে দাঁড়ান। পরবর্তী স্থান ভালোভাবে না দেখে পূর্ববর্তী স্থান ত্যাগ করেন না। তাই উক্ত হয়–

> চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
> নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ॥ ৩০ (অশোককুমার ২০১৭: ২৪)

[চলত্যেকেন = চলতি (√চল্ + লট্-তি) + একেন, নাসমীক্ষ্য = ন + অসমীক্ষ্য (নঙ্-সম্-√ঈক্ষ্ + ল্যপ্)]

বিদেশে বিদ্যা, ঘরে থাকলে মাতা, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঔষধ এবং মৃত ব্যক্তির ধর্মই মিত্রের কাজ করে। তাই উক্ত হয়–

> বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষুচ।
> ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্মো মিত্রং মৃতস্য চা॥ ১০ (মানবেন্দু ২০১১: ২৭)

[ব্যাধিতস্যৌষধম্ = ব্যাধিতস্য + ঔষধম্, ধর্মঃ = ধর্ম (√ধৃ + মন্) + প্রথমা একবচন = ধর্ম + সু]

যদি ভোগ বিলাসের বাসনা থাকে তবে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করো, আর যদি বিদ্যাশিক্ষার ইচ্ছা থাকে তবে ভোগ ত্যাগ করো। ভোগী ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা কোথায়? বিদ্যার্থীর ভোগবাসনাই বা কোথায়? তাই উক্ত হয়–

> ভোগার্থী চেৎ ত্যজেৎ বিদ্যাং বিদ্যার্থী ভোগমুৎসৃজেৎ।
> ভোগার্থিনঃ কুতো বিদ্যা ভোগো বিদ্যার্থিনঃ কুতঃ॥ ১১ (মানবেন্দু ২০১১: ২৮)

[ত্যজেৎ = √ত্যজ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ, ভোগমুৎসৃজেৎ = ভোগম্ + উৎসৃজেৎ (উদ্-√সৃজ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ)]

যেরূপ খন্তাদিয়া ভূমি খনন করলে ভূতল হতে জল পাওয়া যায়, সেরূপ সেবা দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করতে পারলে তবে শিষ্য গুরুর অধিকৃত বিদ্যা লাভ করতে পারে। তাই উক্ত হয়–

> যথা খনন্ খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।
> তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥ ১২ (মানবেন্দু ২০১১: ২৮)

[বিন্দতি = √বিন্দ্ + লট্-তি, শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি = শুশ্রূষুঃ + অধিগচ্ছতি (অধি-√গম্ + লট্-তি)]
যদি শিষ্যকে গুরু একটিও অক্ষর শিক্ষা দেন, পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা দিয়ে শিষ্য গুরুর ঋণ শোধ করতে পারে। তাই উক্ত হয়–

> একমপ্যক্ষরং যন্তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
> পৃথিব্যানং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোঽ নৃণী ভবেৎ॥ ১৩ (মানবেন্দু ২০১১: ২৯)

[একমপ্যক্ষরম্ = একম্ + অপি + অক্ষরম্, প্রবোধয়েৎ = প্র-√বুধ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ, দত্ত্বা = √দা + ক্ত্বাচ্]

জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ধন হলেও, পণ্ডিত বান্ধবহীন হলেও এবং পুত্রপৌত্রবতী নারী বিধবা হলেও তাদের জন্য শোকের কারণ নাই। তাই উক্ত হয়–

অশোচ্যো নির্ধনঃ প্রাজ্ঞো২ শোচ্যঃ পণ্ডিতো২ বান্ধবঃ।
অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা॥ ১৪ (মানবেন্দু ২০১১: ৩০)

[অশোচ্যঃ = নঞ্-√শুচ্ + ণ্যৎ, নির্ধনঃ = নির্ (নিঃ) + ধনঃ]
বিদ্যা কামধেনুর সমান গুণবতী; সে অকালেও ফল দান করে এবং বিদেশে মায়ের মতো পালন করে। চোর বিদ্যাধন হরণ করতে পারে না, সেকারণে একে গুপ্তধন বলা হয়। তাই উক্ত হয়–

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্ত ধনং স্মৃতম্॥ ১৫ (মানবেন্দু ২০১১: ৩০)

[হ্যকালে = হি + অকালে, স্মৃতম্ = √স্মৃ + ক্ত (ক্লীবলিঙ্গে)]
জ্ঞাতিগণ যা বণ্টন করে নিতে পারে না, চোরেও যা হরণ করতে পারে না এবং দানেও যার ক্ষয় নাই, এরূপ বিদ্যারত্নকে মহাধন বলে জানবে। তাই উক্ত হয়–

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥ ১৬ (মানবেন্দু ২০১১: ৩১)

[নীয়তে = √নী + যক্ + লট্-তে, যাতি = √যা + লট্-তি, বিদ্যারত্নম্ = বিদ্যায়াঃ রত্নম্ (ষষ্ঠী তৎ), মহাধনম্ = মহৎ (>মহা) ধনম্]

শাস্ত্রজ্ঞান মনের অনেক সংশয় দূর করে এবং চক্ষুর অতীত বস্তু দেখিয়ে দেয়। শাস্ত্রজ্ঞান সকলের চক্ষুস্বরূপ। যার সেই জ্ঞান নেই, চক্ষু থাকলেও সে অন্ধ। তাই উক্ত হয়–

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্বস্য লোচনং জ্ঞানং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥ ১৭ (মানবেন্দু ২০১১: ৩২)

[দর্শনম্ = √দৃশ্ + অনট্ (ল্যুট্), নাস্ত্যন্ধ = ন + অস্তি + অন্ধঃ]

যে বিদ্যা কেবল পুঁথিতে লিখিত আছে, শিক্ষা করা হয়নি এবং যে ধন অপরের নিকট গচ্ছিত আছে, কাজের সময় সেই বিদ্যা বা সে ধন দ্বারা কোনো উপকার হয় না। তাই উক্ত হয়–

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ ২৩ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৬)

[পুস্তকস্থা = পুস্তকঃ + থা, সমুৎপন্নে = সম্ + উৎপন্নে, তদ্ধনম্ = তদ্ + ধনম্]

বিজ্ঞজনের হাতে রাজকার্যের ভার দিলে যশঃলাভ, প্রচুর অর্থাগম ও অন্তিমে স্বর্গবাস রাজার এই তিন লাভ হয়। তাই উক্ত হয়–

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়োগুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥ ২৪ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৬)

[সন্তি = √অস্ + লট্-অন্তি, বিপুলশ্চ = বিপুলঃ + চ, ধনাগমঃ = ধনস্য আগমঃ (ষষ্ঠী তৎ, আ-√গম্ + ঘঞ্)]

চাণক্য নীতিশাস্ত্রে পৃথকভাবে অবিদ্যা তথা অবিদ্বান

মর্মার্থ: অবিদ্যা জগতে সর্বত্র নিন্দিত হয়। যিনি এই অবিদ্যা অর্জন করেন তিনিই অবিদ্বান বা দুর্জন বা মূর্খ। সাধারণত শাস্ত্রজ্ঞানহীন মানুষ অবিদ্বান হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো পণ্ডিত দুর্জন অবিদ্বান হয়। সেক্ষেত্রে মূর্খ দুর্জন অপেক্ষা পণ্ডিত দুর্জন বেশি ক্ষতিকারক। মূর্খ দুর্জনের স্বভাব অতি সহজেই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিদ্বান দুর্জনের তা হয় না। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাহীন বা অবিদ্বান সম্মান পায় না। এমনকি সমাজের কোনো সভায়ও সে শোভা পায় না। তার জীবন শূন্যময়। সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করলে হয়তো মূর্খকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু তার মূর্খতা প্রকাশ পেলে তার ঐ সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। অনেক সময় মূর্খের গুণাবলি দ্বারা গুণীর গুণাবলি আচ্ছাদিত হয়। মূর্খকে উপদেশ দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। পণ্ডিত মূর্খ মুখে ভালো ভালো কথা বললেও তার ভিতর ছলনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাপের মাথায় অতি-মূল্যবান মণি থাকলেও সে ভয়ঙ্কর। যে-কোনো সময় সে ছোবল মারে। তদ্রূপ বিদ্বান মূর্খের সঙ্গ আমাদের ত্যাগ করা উচিত। কেননা মূর্খের সঙ্গ আমাদের ধ্বংস ডেকে আনে। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে অবিদ্যার তথা অবিদ্বানের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে আমরা অবিদ্যার তথা অবিদ্বানের কুফল সম্পর্কে জানতে পারি। নিম্নে যেসব শ্লোকে অবিদ্যার তথা অবিদ্বানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:
বিদ্যা না থাকলে উচ্চ বংশে জন্মলাভ করলেও কোনো ফল হয় না, নীচ বংশে জন্মালেও যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাঁকে দেবগণও সম্মান করেন। তাই উক্ত হয়–

> কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্তু যো নরঃ।
> অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥ ৪ (মানবেন্দু ২০১১: ২৩)

[দৈবতৈরপি = দৈবতৈঃ + অপি, পূজ্যতে = √পূজ্ + যক্ + লট্-তে]

যেমন পলাশ ফুল সুন্দর হলেও গন্ধহীন বলে কেবল সৌন্দর্যের জন্য তাকে কেউ আদর করে না, সেরূপ উচ্চবংশজাত যুবা বিদ্যাহীন হলেও কারো নিকট আদর পায় না। তাই উক্ত হয়–

> রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
> বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥ ৫ (মানবেন্দু ২০১১: ২৪)

[বিদ্যাহীনাঃ = বিদ্যাভিঃ হীনাঃ (তৃতীয়া তৎ), শোভন্তে = √শুভ্ + লট্-অন্তে, নির্গন্ধাঃ = নির্ (নিঃ) + গন্ধাঃ]

পুত্রকে যে মাতাপিতা বিদ্যাশিক্ষা দেন না, সেই মাতাপিতা পুত্রের কাছে শত্রুরূপে পরিগণিত হন। কারণ, যেরূপ হংসগণ মধ্যে বক শোভা পায় না, সেরূপ বিদ্যা না থাকার জন্য সেই পুত্র কোনো সভায় শোভা পায় না। তাই উক্ত হয়–

> মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
> ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥ ৬ (মানবেন্দু ২০১১: ২৪ – ২৫)

[পাঠিতঃ = √পঠ্ + ণিচ্ + ক্ত, শোভতে = √শুভ্ + লট্-তে, যথা = যদ্ + থাল্ (প্রকারে)]

বিদ্যাহীন ব্যক্তির জীবন শূন্যময়, বান্ধবহীন ব্যক্তির দিক এবং পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্যময়। ধনহীন ব্যক্তি সকলই অন্ধকারময় দেখে, অর্থাৎ কোনো প্রকারেই চিত্তে শান্তি পায় না। তাই উক্ত হয়–

> অবিদ্যাং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবাঃ।

পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ৮ (মানবেন্দু ২০১১: ২৬)

[পুত্রহীনম্ = পুত্রেণ হীনম্ (তৃতীয়া তৎ), দরিদ্রতা = দরিদ্র + তল্]
পুরুষ মূর্খ হলে শোকের পাত্র, রাজহীন রাজত্ব শোকের যোগ্য, খাদ্য পায় না এমন প্রজারা শোকের যোগ্য, যে ভূমিতে শস্য জন্মায় না, সে ভূমি শোকের যোগ্য। তাই উক্ত হয়–

অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যং রাজ্যমরাজকম্।
অনাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যা ভূমিরনুর্বরা॥ ৫৫ (অশোককুমার ২০১৭: ৩৪)

[অবিদ্যঃ = ন-√বিদ্ + যৎ (পুংলিঙ্গে), রাজ্যমরাজকম্ = রাজ্যম্ + অরাজকম্, ভূমিরনুর্বরা = ভূমিঃ + অনুর্বরা]

যার নিজের কোনো বুদ্ধি নাই, শাস্ত্রপাঠ বা শাস্ত্র উপদেশে তার কি ফল হবে? যার দুচক্ষুই অন্ধ, দর্পণদ্বারা তার কি উপকার হবে? তাই উক্ত হয়–

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥ ১০৭ (অশোককুমার ২০১৭: ৫৪)

[নাস্তি = ন + অস্তি, করোতি = √কৃ + লট্-তি, করিষ্যতি = √কৃ + লৃট্-স্যতি]
সুন্দর বসন পরলে মূর্খকেও দূর হতে সুন্দর দেখায়। কিন্তু যতক্ষণ তার মুখ থেকে কথা বের না হয়, ততক্ষই তার শোভা। তাই উক্ত হয়–

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥ ১৮ (মানবেন্দু ২০১১: ৩২)

[দূরতঃ = দূর্ + তস্, তাবচ্চ = তাবৎ + চ, কিঞ্চিন্ন = কিঞ্চিৎ + ন, ভাষতে = √ভাষ্ + লট্-তে]
যেমন মেঘ দ্বারা সূর্যকিরণ আচ্ছাদিত হয়, সেরূপ পরস্পর পশুবৎ আচরণকারী মূর্খের দ্বারা পরিবৃত গুণীর গুণাবলিও আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। তাই উক্ত হয়–

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥ ১৯ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৩)

[প্রচ্ছাদ্যন্তে = প্র-√ছদ্ + লট্-অন্তে, মেঘৈরিব = মেঘৈঃ + ইব]

গুণ না থাকলেও কেবল রূপের কোনো মর্যাদা নেই, দুর্জন উত্তম কুলে জন্মালেও কেউ তাকে সম্মান করে না, সদাচার না থাকলে বিদ্যার কোনো ফল হয় না এবং ভোগ না করলে ধন দ্বারাও কোনো লাভ হয় না। তাই উক্ত হয়–

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা চাভোগেন হতং ধনম্॥ ২০ (মানবেন্দু ২০১: ৩৪)

[হতম্ = √হন্ + ক্ত (ক্লীবলিঙ্গে), হতা = √হন্ + ক্ত (স্ত্রীলিঙ্গে), চাভোগেন = চ + অভোগেন]
যেরূপ সর্প দুগ্ধ পান করলে তার বিষ ক্রমে বৃদ্ধিই পায়, কমে না, সেরূপ মূর্খকে উপদেশ দিলে তার ক্রোধ বৃদ্ধিই পায়, হ্রাস হয় না। তাই উক্ত হয়–

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ২১ (মানবেন্দু ২০১: ৩৪)

[পয়ঃপানম্ = পয়সঃ পানম্ (ষষ্ঠী তৎ, √পা + অনট্), মূর্খাণাম্ = মূর্খ + ষষ্ঠী বহুবচন = মূর্খ + আম্]
দুষ্ট ব্যক্তি মুখে মিষ্টকথা বললেও তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ তার জিহ্বার অগ্রভাগে থাকে মধু আর অন্তরে থাকে বিষ। তাই উক্ত হয়–

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥ ২২ (অশোককুমার ২০১৭: ২১)

[দুর্জনঃ = দুর্ (দুঃ) + জনঃ, নৈতদ্ = ন + এতদ্, জিহ্বাগ্রে = জিহ্বা + অগ্রে]

দুষ্টলোক বিদ্যা দ্বারা শোভিত অর্থাৎ বিদ্বান হলেও তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। সাপ মণি দ্বারা ভূষিত হলেও কি ভয়ানক নয়? অর্থাৎ অবশ্যই ভয়ের কারণ হয়ে থাকে। তাই উক্ত হয়–

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥ ২৩ (অশোককুমার ২০১৭: ২১)

[পরিহর্তব্যঃ = পরি-√হৃ + তব্য, ভূষিতঃ = √ভূষ্ + ক্ত (পুংলিঙ্গে), কিমসৌ = কিম্ + অসৌ]

মূর্খের হাতে রাজকার্যের ভার দিলে অযশ, অর্থনাশ এবং নরকে গমন এই তিন দোষ রাজার ঘটে। তাই উক্ত হয়–

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥ ২৫ (মানবেন্দু ২০১১: ৩৭)

[অযশশ্চার্থনাশশ্চ = অযশঃ + চ + অর্থনাশঃ + চ, গমনম্ = √গম্ + অনট্ (ল্যুট্), তথা = তদ্ + থাল্ (প্রকারে)]

এই সময়ে চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান এর প্রাসঙ্গিকতা

চাণক্য-নীতিশাস্ত্র প্রাচীনকালে রচিত হলেও এই সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তিনি তাঁর সমাজের বিদ্যা-অবিদ্যাধারী তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড নীতিকথার মাধ্যমে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন, যা বর্তমানেও সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষের জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমন জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার তথা জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান না থাকলে মানুষ এক পা-ও চলতে পারে না। জ্ঞানের অভাবে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই জ্ঞানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেই মহামতি চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্র রচনা করেছেন। আমরা তাঁর নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান সম্পর্কে বক্তব্য জীবনে সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর মতে সমাজের প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পায় না। তখন সন্তানের কাছে পিতা-মাতা শত্রুতে পরিগণিত হয়। উক্ত হয়–

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতাঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥ ১৫ (চৈতালী ২০১৪: ৩৩)

আজ সমাজে বিদ্বান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিদ্বান মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অপরদিকে অবিদ্বান লোকের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে নৈতিক বিদ্বান লোকের

কোনো মূল্য নেই। চারদিকে বিদ্বান ও অবিদ্বানের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাজকে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। ফলে উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ইত্যাদি মূল্যবোধের মতো মানবিক গুণাবলি আজ চারিদিকে প্রায় ভুলুণ্ঠিত। বিশ্বব্যাপী এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে চাণক্যের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানসম্পর্কিত বক্তব্য আমাদের স্খলিত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারে। এ কারণে– যে শাস্ত্র পাঠ করে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান জন্মায় সেই একশত আট শ্লোকবিশিষ্ট শাস্ত্র চাণক্য প্রণয়ন করেন। উক্ত হয়–

> যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।
> শতমষ্টোত্তরং পদ্যং চাণক্যেন প্রযুজ্যতে॥ ১০৯ (সত্যনারায়ণ ১৯৯০: ১০৬ – ১০৭)

চাণক্যের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানসম্পর্কিত বক্তব্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ গ্রহণ করতে পারে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, চাণক্য নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বানসম্পর্কিত আলোচনা মানব কল্যাণমুখী এক শিক্ষা। তিনি লোকশিক্ষার এক মহান দায়িত্ব নিয়ে এ আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য সর্বকালে, সর্বদেশে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানবজীবনে বিদ্যা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ভিতরকার অবিদ্যাকে দূর করতে হবে। আজ আমাদের সমাজে বিদ্বানের সম্মান কম। যথাযথভাবে তাঁদের মূল্যায়ন করা হয় না। পক্ষান্তরে অবিদ্বানের কদর বেশি। এদের কর্মকাণ্ডে সমাজ আজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে আমাদের চাণক্যনীতিশাস্ত্র উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। চাণক্যের বিদ্যা-অবিদ্যাসম্পর্কিত বক্তব্য তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের কর্মকাণ্ডের বার্তা আরেকবার সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই এ লেখায় আমি প্রয়াসী হয়েছি। আমার মতে তাঁর বিদ্যা-অবিদ্যা তথা বিদ্বান-অবিদ্বান কেন্দ্রিক আলোচনা আমাদের মনুষত্বকে জাগ্রত করতে পারে। তাই আজকের পৃথিবীতে চাণক্য নীতিশাস্ত্রের বিদ্যা-অবিদ্যার তথা বিদ্বান-অবিদ্বানের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

উল্লেখপঞ্জি

অতুল চন্দ্র সেন ও অন্যান্য (২০০০)। *উপনিষদ*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৭)। *চাণক্যশ্লোক*, সদেশ, কলকাতা।

অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১১ বঙ্গাব্দ)। *সংস্কৃত-বাংলা অভিধান*, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা।

চৈতালী দত্ত (২০১৪)। *চাণক্য-সংগ্রহ*, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

জগদীশচন্দ্র ঘোষ (১৯৯৬)। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলিকাতা।

দুলাল ভৌমিক (২০১৮)। *ভর্তৃহরির নীতিশতক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০২৪)। *চাণক্যশ্লোক*, পারুল প্রকাশনী প্রা.লি., কলকাতা।

প্রসূন বসু (২০১৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (পঞ্চদশ খণ্ড: পঞ্চতন্ত্র– বিষ্ণুশর্মা) [সম্পাদিত], নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

প্রসূন বসু (২০১৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (ত্রয়োদশ খণ্ডঃ হিতোপদেশ– নারায়ণ পণ্ডিত) [সম্পাদিত], নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)। *চাণক্য-সুভাষিত-শ্লোক-সংগ্রহ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।

মালবিকা বিশ্বাস ও ময়না তালুকদার (২০২৩)। *চাণক্য সার-সংগ্রহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (১৯৯০)। *চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।

সহায়ক ব্যাকরণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২০১১)। *সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী* [আশুতোষ দেব সম্পাদিত], দেব সাহিত্য কুটির (প্রা.লি.), কলিকাতা।

সহায়ক অভিধান

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫)। *সংস্কৃত-বাংলা অভিধান*, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (২০০৫)। *শব্দসার* (সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান) [সংকলিত], সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।